Nahan Chitthi, Burdwan, Puja Number, 1996

নগরায়ণের সমস্যা

নগরোন্নয়ন নীতি কোন পথে চলছে ঃ

মেগা শহর প্রসঙ্গে কিছু চিন্তাভাবনা

কুন্তলা লাহিড়ী-দত্ত

■ গোড়ার কিছু ধারণা

পৃথিবীর সব দেশেই, তা সে উন্নত বা অপেক্ষাকৃত কম উন্নত যেমনই হোক না কেন, মেগা-শহরগুলিকে নিয়ে আজ অবধি বিতর্কের অন্ত নেই। একটি দেশের অর্থনীতিতে মেগা-শহরগুলির ভূমিকা নিয়ে নগর-বিশেষজ্ঞ ও নীতি-নির্ধারকেরা আলোচনা করে চলেছেন। মেগাশহরের আলোচনায় দুটি মূল দৃষ্টিবিন্দু ক্রমশ গড়ে উঠেছে, একদিকে বিতর্ক চলছে এসব শহরগুলির অর্থনৈতিক দক্ষতা (economic efficiency) বাড়ানোর উপায় নিয়ে, অন্যদিকে প্রশ্ন উঠেছে সামাজিক সাম্য বজায় রাখার জন্য এসব শহরের আরও বিকাশ ঘটানো উচিত কি না। এখনও পর্যন্ত আলোচনার মাধ্যমে কোনো ঐকমত্যে পৌছানো যায়নি। মেগা-শহরগুলি তো আর আলাদা ইউনিট নয়; কোন জটিল প্রক্রিয়ায় তারা তাদের নিজ নিজ পশ্চাদ্‌ভূমির সঙ্গে ক্রিয়ামূলক বন্ধনে বাঁধা, তাকে ভালো করে বোঝা হয়ে ওঠেনি।

একটি দেশে নানা আয়তনের অসংখ্য জনবসতি রয়েছে, যাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে এক বসতি প্রণালী (settlement system)। এই সিস্টেমের সর্বোচ্চ চূড়ায় রয়েছে সবচেয়ে বড় এক মেগা-শহর। প্রতিটি দেশেরই অর্থনীতি ও জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই বৃহদায়তন শহরগুলি। বিভিন্ন যুগে নগর-বিশেষজ্ঞরা এসব শহরের নানা নাম দিয়েছেন — প্রাইমেট, রাজধানী, এবং গেটওয়ে - বন্দর শহর। মার্ক জেফারসনের মতে প্রাইমেট শহর হল 'সুপার এমিনেন্ট' (super eminent) — শুধু আয়তনেই নয়, জাতীয় প্রভাবেও। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদ জমাট বাঁধে এসব শহরে। জেফারসনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে দু'ধরনের

চিন্তা — একদল বিশেষজ্ঞ মনে করেছেন এই বড় শহরতলি তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে ঔপনিবেশিক অতীতে গড়ে উঠেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপনিবেশের রাজধানী বা উপকরণ-সঞ্চালনের উপযোগী ডিপো (depot) হিসাবে। অন্য দল মনে করেন, কোনো দেশের পুরো বসতি-প্রণালী যেভাবে, যে নিয়মে চলে তার থেকে বড় শহরগুলি কোনো মতেই আলাদা নয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে এরকম মেগা-শহর গড়ে ওঠার সম্বন্ধ রয়েছে বলেও অনেক মনে করেন।

■ তৃতীয় বিশ্বের মেগাশহর

পৃথিবীর মেগা-শহরগুলি কোথায় কোথায় অবস্থিত সেদিকে নজর দিলে বোঝা যাবে আজকের দিনে পৃথিবীর কম উন্নত দেশগুলিতেই রয়েছে বেশিরভাগ মেগাশহর — কোলকাতা ও মুম্বাই তো আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে এবং প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে। সমস্ত তৃতীয় বিশ্ব জুড়েই রয়েছে এরকম অনেকগুলি মেগা-শহরের সরব উপস্থিতি — ম্যানিলা, জাকার্তা, ঢাকা, করাচী, কলম্বো, কায়রো, রিও-ডি-জেনিরো এর মধ্যে অল্প কয়েকটি মাত্র নাম।

উন্নত বিশ্বের শহরগুলি থেকে জাতে সম্পূর্ণ আলাদা এসব শহর; শিল্পোন্নয়নের ঢেউ এদের তেমনভাবে ছুঁয়ে যায়নি। পশ্চিমের প্রাইমেট শহর গড়ে উঠেছে জাতীয় পুঁজিবাদী বাজারে সুসংহত হয়ে ওঠার মাধ্যমে, আর তৃতীয় বিশ্বে বাজার খণ্ডীকরণের মাধ্যমে, উদ্বৃত্ত কেন্দ্রীভবনের কারণে। কম উন্নত দেশগুলির সমস্ত উন্নয়ন কেন্দ্রীভূত হয়েছে এসব শহরে। এই শহগুলির সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য এমনই যে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা, পরিচালনা, আর্থিক গুরুত্ব, উৎপাদন ও বন্টনের কেন্দ্রিকতা পুরোপুরি রক্ষিত হচ্ছে তাতে।

নগরোন্নয়নের নীতি এসব ক্ষেত্রে কী হবে? একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন অবিলম্বে বিকেন্দ্রীকরণ শুরু করা দরকার, যাতে অপেক্ষাকৃত ছোট ও মাঝারি আয়তনের শহরগুলির কর্মসংস্থান ক্ষমতা বাড়ে এবং বহির্কাঠামোর উন্নতি ঘটে। আবার মেগাশহরে উন্নয়নের কেন্দ্রীভবনের সমর্থনে যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে যেহেতু গরিব দেশগুলিতে বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির অভাব রয়েছে, সেকারণেই অর্থনৈতিক দক্ষতা বজায় রাখার জন্য এসব শহরের প্রয়োজন আছে। এই যুক্তির দুর্বলতা লক্ষ করুন। মেগাশহরগুলিতে জড়ো হয়েছে দেশের সমস্ত সামাজিক ও অন্যান্য বহির্কাঠামো। অর্থাৎ মেগাশহরের ক্রমাগত উন্নয়ন দেশের মধ্যের আর্থিক বৈষম্য টিকিয়ে রাখবে যদি ছোট ও মাঝারি শহরগুলিতে বহির্কাঠামো গড়ে তোলা না যায়।

১৯৯১ সালের হিসেব অনুযায়ী ভারতে মোট শহরের সংখ্যা ৪,৬৮৯। এর মধ্যে বড় শহরের জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। স্বাধীনতার সময়ে দশ লক্ষ (মিলিয়ন) শহর ভারতে ছিল মাত্র দুটি; আজ এই সংখ্যা ২৩টি। এই তেইশটি মিলিয়ন শহরে মোট নাগরিক জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ থাকে। এগুলোর মধ্যে পাঁচটি — বিশাখাপত্তনম্, হায়দ্রাবাদ, লুধিয়ানা, সুরাট ও লখনউ গত দশকে প্রায় সত্তর শতাংশ বেড়েছে। তবে মুম্বাই, কোলকাতা, মাদ্রাজ ও দিল্লি শহর আগের চেয়ে ধীরে বেড়েছে।

'মেগাসিটি' শব্দটি সেন্সাস ব্যবহার করছে অনেকগুলি 'সিটি'-র (এক লক্ষের বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট শহর) সমাহার হিসেবে গড়ে ওঠা নগরপিণ্ডগুলিকে — যেমন বৃহত্তর মুম্বাই (১.২৫ কোটি), বৃহত্তর কোলকাতা (১.১০ কোটি), দিল্লি (৮৪ লক্ষ) এবং মাদ্রাজ (৫৪ লক্ষ) — বোঝাতে। এসব শহরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার গ্রামাঞ্চলের চেয়ে বেশি হলে কি হবে, তা দ্রুতবর্ধমান শ্রমশক্তির তুলনায় কিছুই নয়। তাছাড়া শিল্পক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার শ্রম নিয়োগের ক্ষমতাও যে কমে আসবে এটিও মোটামুটি আজ সকলেই মেনে নিয়েছেন। সুতরাং বেশিরভাগ কর্মসংস্থান ঘটতে হবে তৃতীয় স্তরের (tertiary) কাজকর্ম — চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে। অর্থাৎ মেগাশহরগুলির অর্থনীতির মূল ভিত্তি, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে, তৃতীয় স্তরের কাজকর্মে। মেগাশহরগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার সময়ে এই মূল কথাটিও ভোলার নয়।

■ নগর পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি

উন্নতিশীল বিশ্বের ক্রমবর্ধমান শহর ও তাল রাখতে না পেরে দ্রুত পিছিয়ে পড়া নাগরিক পরিষেবার সমস্যা আলোচনার জন্য বিশ্বব্যাংক গড়ে তুলেছে 'নগর পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি'। এই 'নগর পরিচালনা' (urban management) শব্দটির নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। মোটামুটিভাবে এতে রয়েছে চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ঃ

১। সমগ্র শহরব্যাপী ও প্রতিষ্ঠানগত বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে নগরোন্নয়নকে আলোচনা করার চেষ্টা;

২। আরও বিকেন্দ্রিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলায় স্থানীয় মূলধন-উৎসের দিকে বেশি নজর দেওয়ার চেষ্টা;

৩। জল সরবরাহ, জল পরিবহণ, বিদ্যুৎ, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ও আবর্জনা সাফ প্রভৃতি নাগরিক পরিষেবা সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিকল্প উপায়ের সন্ধান; এবং

৪। নাগরিক পরিষেবা ও বহির্কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্থানীয় বাসিন্দাসমূহের সমর্থন ও অংশগ্রাহী উৎস খোঁজা এবং উন্নীত করা।

তৃতীয় বিশ্বের শহরোন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে অর্থসাহায্যের মাধ্যমে আজকাল যে প্রকল্পগুলি নেওয়া হচ্ছে, সেগুলিতে এরকম দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানে প্রাধান্য লাভ করেছে। এর কারণ খুবই সহজ। ১৯৮০-র দশকের আগে বৃহদায়তন আশ্রয় প্রকল্প (shelter project) গড়ে তোলার ওপরে ঝোঁক ছিল। কোলকাতাতে তো বটেই, ভারতের অন্যান্য শহরগুলিতেও বস্তিবাসীদের জন্য এরকম প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, আমরা জানি। কিন্তু ক্রমশই বোঝা গেছে যে তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলিতে এতে প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু কাজের কাজ তেমন কিছুই হয়নি। এ ধরনের প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে বিশেষ একটি স্থল (site) উন্নয়ন ও পরিষেবার বন্দোবস্ত করা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বস্তি উন্নয়ন জাতীয় কাজ হয়েছিল। এসব প্রকল্পের মূল্যায়ন করতে গিয়ে দেখা গেল, যে উদ্দেশিত গোষ্ঠীর (target group)

জন্য এসব প্রকল্প তাদের কাছেই ঠিকমত সুযোগ-সুবিধেগুলিকে পৌঁছাতে পারা যায়নি। অনেকক্ষেত্রে বস্তি উন্নয়নের জন্য তৈরি বাড়িগুলো শহরের গরিবদের হাতে থাকার বদলে মধ্য ও উচ্চ আয়বিশিষ্ট গোষ্ঠীদের মালিকানায় চলে গেছে।

বিশ্বব্যাংকের বিশেষজ্ঞরা আরও একটি বিষয় দেখালেন। শহরের দরিদ্রশ্রেণীর আশ্রয় তৈরি করে দিতে গিয়ে যে পরিমাণ খরচ হয় তার বেশির ভাগটাই আসে সাবসিডি থেকে। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের কিস্তির সুদের হার কমানো থেকে শুরু করে জমি অধিগ্রহণের খরচ কম দেখানো, প্রকল্প গড়ে তোলা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ — সব ক্ষেত্রেই প্রকৃত ব্যয়ের চেয়ে কম হিসেব ধরা। দেখা গেল এভাবে বিপুল ব্যয়ে তৃতীয় বিশ্বের বড় শহরগুলিতে যেসব রাস্তাঘাট, জল সরবরাহ ব্যবস্থা ও অন্যান্য পরিষেবা গড়ে তোলা হল, সঠিক দেখাশুনোর অভাবে অল্পদিনের মধ্যেই তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার দৌর্বল্যের জন্যই রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে আফ্রিকায়।

এর ফলে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতিতে গত দশ-পনেরো বছরে বিরাট এক পরিবর্তন এসেছে। গ্রাম ও শহরের গরিবদের জীবনধারণের মৌলিক সুযোগসুবিধে এনে দেবার বদলে ঝোঁক এখন উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও দক্ষ পরিচালনার ওপরে।

এছাড়া নগর পরিচালনা দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন আরও এসেছে জনপ্রশাসন এবং ম্যানেজমেন্ট চিন্তাধারার একত্রে মিলন থেকেও। প্রথমে ছিল উন্নয়নমুখী প্রশাসন, তা থেকে আরও ব্যবসামুখী ম্যানেজমেন্ট-এর ধারণা এল, এবং শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠল উন্নয়ন পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি। সুতরাং শুধু ব্যক্তিগত উদ্যোগ নয়, রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরের ক্ষেত্রেও জোর দেওয়া শুরু হল তিনটি বিষয়ে — ক্যাপাসিটি, পারফরমেন্স ও কস্ট এফিসিয়েন্সি (capacity, performance and cost efficiency)। ফলে উন্নতিশীল দেশগুলির উন্নয়নের [illegible] (privatization)-এর গুরুত্ব বাড়তে থাকল। সরকারি ক্ষেত্রে নিজীকরণের সুবিধে হল সেখানে ভোক্তার থেকে সরাসরি দ্রব্য ও পরিষেবার ব্যয় উঠিয়ে নেওয়া যায়। আর ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে তো জনপ্রশাসনের বদলে ম্যানেজমেন্ট বা পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি আগে থেকেই রয়েছে। অর্থাৎ মোদ্দা ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে এই : 'নগর পরিচালনা' শব্দটা নতুন হলেও কিছু চিরাচরিত ধারণাই এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এই ধারণাগুলি হল বৃহদায়তন সংগঠনের সঠিক পরিচালনা এবং শহরের সরকারি এজেন্সিগুলিকেও দক্ষতার মাপকাঠিতে বিচার করা। এই যুক্তিগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই দেখতে হবে 'মেগাসিটি' প্রকল্পকে।

ইতিমধ্যে অনেক বিশেষজ্ঞ এই নগর পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবসায়িকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ভারতে মেগাশহর প্রকল্পগুলিতে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে নেওয়া হলে এর ফলে শহরের গরিবদের ভবিষ্যৎ যে ঠিক কোন পথে চলবে তা এখনও সুষ্ঠু বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। এদিকে পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলির ক্রমবর্ধমান শহরের ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল 'দ্বিতীয় বসতি সম্মেলন' (হ্যাবিটাট II)। সেখানে আমরা ঘোষণা করেছি 'সকলের জন্য আশ্রয়', অথচ একবিংশ শতাব্দীর প্রায়াহ্নে দাঁড়িয়ে গ্রহণ করছি মেগাশহরের জন্য নগর পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি। এই দু-এর মধ্যে বিরোধিতা বড়ই প্রকট। কারণ আজ মেগাশহর উন্নয়নে যে ধরনের নীতি গৃহীত হবে, কাল তা ছোট ও মাঝারি আয়তনের শহরগুলির ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। শহরাঞ্চলের — সে বড় বা ছোট যে-কোনও শহরই হোক না — দরিদ্রদের আবাসনের অধিকারের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে এই নীতি নির্বাচন প্রসঙ্গে।

■ মেগাশহর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

ভারতে নাগরিক জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, বিশেষত মেগাশহরগুলির অপ্রতিরোধ্য গতিতে বৃদ্ধি পাওয়া নিয়ে চিন্তিত কেন্দ্রীয় জাতীয় নগরায়ণ আয়োগ (National Commission on Unbanization)। এই কমিশন ১৯৮৮ সালে তার রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টের পর্যবেক্ষণ থেকেই মেগাসিটি প্রকল্পের জন্ম। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, বড় শহরগুলির এলোপাথাড়ি বৃদ্ধির গতি কমাতে হবে। দিল্লি-মুম্বাই-কোলকাতা-মাদ্রাজ — এই চারটে 'সুপার মেট্রো'কে 'জাতীয় শহর' হিসেবে ঘোষণা করতে হবে এবং তাদের বিকাশ ও রক্ষণাবেক্ষণকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

এই রিপোর্ট প্রকাশের পর ১৯৯১ সালের জনগণনা হয়েছে। ভারতীয় সেনসাস উপরোক্ত চারটির সঙ্গে হায়দরাবাদ ও ব্যাঙ্গালোরকেও যুক্ত করেছেন মেগাশহরের তালিকায়। এই পরিস্থিতিতে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল ৫,২০০ কোটি টাকার একটা প্রকল্প অনুমোদন করেছে কলকাতা, মুম্বাই, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর ও হায়দরাবাদের বহির্কাঠামোর নিবিড় উন্নয়নের জন্য। এই টাকা আসবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের থেকে, এবং সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির (যেমন ব্যাংক প্রভৃতি) ঋণভাণ্ডার থেকে। এই অতি-উচ্চাশী জাতীয় প্রকল্পেরই নাম 'মেগাসিটি স্কীম' বা মেগাসিটি প্রোগ্রাম। আশা করা হচ্ছে এর মাধ্যমে পাঁচটি সুপার মেট্রো শহরের অতিপ্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগুলি, যেমন জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী, পরিবহণ প্রভৃতি ব্যবস্থাকে সুঠাম ও পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা যাবে। ফলে শুধুমাত্র বর্তমান সমস্যাগুলিই নয়, ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বিকাশ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিরও মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। এগুলি ছাড়া দিল্লির জন্য আলাদাভাবে নেওয়া হচ্ছে 'জাতীয় রাজধানী অঞ্চল পরিকল্পনা' (National Capital Region Plan) ১৯৮৮ সাল থেকে।

বৃহদায়তন শহরগুলির উন্নয়নের জন্য টাকা আসবে কোথা থেকে — এ প্রশ্ন আজকের নয়। জাতীয় নগরোন্নয়ন আয়োগের মতে ভারতের প্রধান চারটি মেট্রোশহরকে 'জাতীয় শহর' আখ্যা দিয়ে

কোষ থেকে অর্থবরাদ্দ করা হোক। অন্যদিকে প্ল্যানিং কমিশনের মতে বিশেষ কয়েকটি শহরের জন্য এভাবে কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়ার বদলে রাজ্যগুলির নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকেই এবাবদে অর্থ বরাদ্দ করা হোক। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্ল্যানিং কমিশন মেগাশহরের উন্নয়নের জন্য রাজ্যগুলিকে টাকা দিয়ে এসেছে। সুতরাং এ নিয়ে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রক, প্ল্যানিং কমিশন এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা আলোচনায় বসেন ১৯৯২ সালে। এই আলোচনার মধ্য থেকে ১৯৯৩ সালে গড়ে ওঠে 'স্কীম অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট ইন মেগা সিটিজ'। প্ল্যানিং কমিশন এই স্কীম অনুমোদন করেছে।

এই মেগাশহর উন্নয়নের স্কীমের মূল বিষয়গুলি কি? প্রথমত, এই স্কীম গড়ে তোলা হয়েছে পাঁচটি শহর — মুম্বাই, কোলকাতা, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর এবং হায়দরাবাদের জন্য। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের মাধ্যমে এই স্কীম কার্যকরি হবে এবং রাজ্য পর্যায়ে বিশেষ কোনো-একটি প্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্রিক (nodal) এজেন্সির মাধ্যমে (যেমন কোলকাতার জন্য সি এম ডি এ) এর ব্যয় পরিচালিত হবে। অবশ্য রাজ্য সরকার তাঁদের ইচ্ছেমত অন্য যে-কোনো এজেন্সিকেও বেছে নিতে পারেন এই কাজের জন্য। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এই স্কীমের খরচার এক-চতুর্থাংশ করে বহন করবেন। বাকি ৫০ শতাংশ খরচ আসবে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে এবং পুঁজি-বাজার থেকে। ব্যক্তিগত বিনিয়োগের মাধ্যমেও এই খরচের কিছুটা উঠিয়ে নেওয়া সম্ভব হতে পারে। অথবা ভারপ্রাপ্ত এজেন্সি নিজেও ঋণগ্রহণ করতে পারে। চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ফান্ড সরাসরি এসব এজেন্সির কাছে আসবে, এবং তাদের মাধ্যমে পৌঁছাবে নানা ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি (যেমন মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনগুলি)-র হাতে। গ্রান্ট এবং ঋণের মিশ্রণ হিসেবে এরা এই টাকা পাবে। ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সিগুলি এক-একটি প্রকল্প জমা দিলে তা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি (যেখান থেকে ঋণ নেওয়া হচ্ছে) খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখে তবেই অনুমোদন দেবে। অর্থাৎ এই স্কীমের মাধ্যমে বহির্কাঠামো গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ফান্ড গঠন করা যাবে। মেগাশহরগুলির জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী, জলনিকাশি, পরিবহণজাল, ভূমি উন্নয়ন, বস্তি উন্নয়ন, আবর্জনার বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে এসব প্রকল্প হবে। তবে এনার্জি, টেলিযোগাযোগ, পরিবহণের মাধ্যমে (যেমন বাস-ট্রাম প্রভৃতি কেনা), প্রাথমিক স্বাস্থ, শিক্ষা প্রভৃতির জন্য এবং স্থানীয় ফান্ডের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা যায় এমন ছোটোখাট প্রকল্পের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে না। আবার অত্যন্ত পুঁজি-নিবিড় ও দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষা প্রকল্পও এর আওতায় আসবে না। কেবল সেই প্রকল্পগুলিকেই অনুমোদন দেওয়া হবে যেগুলো আঞ্চলিক বা মেট্রোপলিটান মাস্টার প্ল্যানের উদ্দেশ্য ও নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে। সীমাবদ্ধ প্রভাবযুক্ত যেসব স্থানীয় প্রকল্প মিউনিসিপ্যালিটিগুলি গ্রহণ করে তাদেরও অনুমোদন দেওয়া হবে না। এসব কিছুই পরিচালিত হবে মূল এজেন্সির একটি পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে।

আর্থিক লাভজনকতার উপরে বেশি জোর দিয়ে নগর পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করলে ভারতের মত গরিব দেশে তা সার্থক না হবার সম্ভাবনাই প্রবল। আর্থিক দক্ষতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অন্তত ভারতের বা কোলকাতার পরিপ্রেক্ষিতে, হল দরিদ্র শহরবাসীর সামনে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ভালোভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার বন্দোবস্ত করা।

মেগাসিটি স্কীমের অন্তর্গত প্রকল্পগুলি তিন ধরনের ঃ

ক) লাভদায়ক, অর্থাৎ যেগুলি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্ভরযোগ্য;

খ) যেগুলিতে ব্যবহারকারীর উপরে চার্জ ধার্য করা যায়, এবং এছাড়া আরও কতকগুলো একান্ত প্রয়োজনীয় (অথচ চার্জ ধার্য হয় না এমন) তবে যার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আয় সৃষ্টি হয়; এবং

গ) ন্যূনতম পরিষেবা সংক্রান্ত প্রকল্প, যেগুলিতে বিনিয়োগ থেকে অল্প লাভ হয় বা আদৌ কোনও লাভ হয় না। অর্থাৎ একটা মেট্রোশহরের জীবনযাত্রার মানকে উন্নীত করার জন্য যা নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

প্রথম দুটি শ্রেণীর জন্য নিম্নহারে সুদ ধার্য হবে এবং কোন গ্রান্ট দেওয়া হবে না। তৃতীয় শ্রেণীটির ক্ষেত্রে দারিদ্র দূরীকরণের বিষয়টিও যদি অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে সামান্য কিছু গ্রান্টের বন্দোবস্ত হবে। তবে নির্ভরযোগ্য, লাভজনক প্রকল্পগুলি প্রথমে কার্যকর ক'রে তা থেকে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি ক'রে এই তৃতীয় শ্রেণীর প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা চলবে।

■ আলোচনা

মোটামুটিভাবে এই হল মেগাসিটি স্কীম। এই স্কীম অনুসারে মুম্বাইতে দু-একটি প্রকল্পে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে নিকট ভবিষ্যতে কোলকাতাও এই স্কীম নিয়ে কাজ শুরু করবে। এসময়ে এই স্কীমের কিছু ভালোমন্দ দিক নিয়ে আলোচনা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভারতের শহর-বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই এই স্কীম নিয়ে তীব্র বিতর্ক তুলেছেন। প্রতিটি বিষয়েই এক দর্শন থাকে, যাকে 'গাইডিং স্পিরিট' বলা চলে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে মেগাসিটি স্কীমের পিছনে আছে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগর পরিচালনার দর্শন। তাই সবচেয়ে প্রথমেই প্রশ্ন উঠেছে যে ঠিক কি ধরনের কোন প্রকৃতির হবে এই প্রস্তাবিত মেগাশহর। কার জন্য গড়ে তোলা হবে এই পরিকল্পিত মেগাসিটি? অর্থাৎ প্রতিটি পরিকল্পনাতে যে সামাজিক দিকটি থাকে — মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত না কি দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের জন্য পরিকল্পনা — এখানে তা ঠিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে না কোথাও। দরিদ্র শ্রেণীর

আবাসন-সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে এই স্কীমের মাধ্যমে মেটানো প্রায় অসম্ভব। আর ভারতে নগর-পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে নাগরিক বহির্কাঠামো বাড়িয়ে মূল সমস্যাগুলির সমাধান তো দূরের কথা, নাগালই পাওয়া যায়নি। ভারতের মত দেশে, যেখানে গ্রাম-শহরের ফারাক, বিশেষত গ্রাম ও মেট্রোশহরের মধ্যের পার্থক্য চোখে পড়ার মত, সেখানে নাগরিক বহির্কাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি কোনো লাভ পাওয়া সম্ভব নয়। গ্রাম থেকে আগত বিপুল জনসংখ্যার চাপে ওই নবগঠিত বহির্কাঠামোও দ্রুত ভেঙে পড়ে, তাকে আর যথেষ্ট বলে মনে হয় না।

ভারতের মেগাশহরগুলি যে-হারে আয়তনে বাড়ছে, তাতে জনসংখ্যার চাপ এক জটিল রূপ নিয়েছে। শহর বাড়লে পরিবহণের মাধ্যম বাড়বে — অসংখ্য গাড়ি ও বাস প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবহণ প্রয়োজন মেটানোর জন্যও শহরকে প্রস্তুত হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু এরই সঙ্গে বাড়বে পরিবেশ দূষণের সমস্যাও। এই পরিবেশগত সমস্যাটি আবার জটিল, কারণ এর সমাধানে আর্থিক ব্যয়ের থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বা টাকার হিসেবে তেমন কোন লাভ আসে না। অথচ সাম্প্রতিককালে ভারতের মেগাশহরগুলিতে পরিবেশ দূষণের মাত্রা বাড়তে বাড়তে প্রায় বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। মেগাশহর প্রকল্পের কোথাও পরিবেশের বিষয়টির উল্লেখ আদৌ নেই। প্রতিটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনারই কিন্তু একটা পরিবেশগত দিক থাকে। মেগাসিটি স্কীমের খুঁটিনাটি আর্থিক নিয়মকানুনের কচকচির মধ্যে তা উহ্য রয়ে গেছে, এ বড়ই দুঃখের বিষয়।

এমন কথাও উঠেছে যে কোলকাতার মত মেগাশহর, যেখানে এই মুহূর্তে মাস্টার প্ল্যান বলে তেমন কিছু নেই (বেসিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানের মেয়াদ তো কবেই ১৯৮৬ সালে শেষ হয়ে গেছে), তার ক্ষেত্রে নগরোন্নয়ন প্রকল্পগুলির দিক্‌নির্দেশ হবে কী করে? আবার ধরুন কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি মেগাসিটি স্কীমের সঙ্গে এ ধরনের মাস্টার প্ল্যানের বৈপরীত্য ঘটে তাহলেই বা কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে? এটা পরীক্ষা করার, নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্ব কার?

মেগাসিটি স্কীমের অন্তর্গত প্রকল্পগুলির আর্থিক লাভদায়কতার দিকটি ছাড়াও রয়েছে একটা প্রাযুক্তিক দিক — সেখানে কার ভূমিকা থাকবে নিয়ন্ত্রকের? বা ঠিক কোন স্তরের প্রযুক্তি গৃহীত হবে — সে সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব কার? প্রকল্পগুলির রূপায়ণে কেন্দ্রিক এজেন্সি ছাড়াও ঠিকাদারদের কী ভূমিকা থাকবে? এছাড়া ভারতীয় মেগাশহরগুলিতে এখনও কৃষি ও তৎসংক্রান্ত কাজকর্মের ভূমিকা অগ্রাহ্য করার মত নয়। তারই বা কী হবে? এসব অঞ্চলের দ্রুত পরিবর্তনশীল ভূমি-ব্যবহার সম্পর্কেও তো নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা নেই! এছাড়া পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ এলাকা ও তার কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা মেগা-শহর প্রকল্পের অন্তর্গত না হলে তো তার মূল উদ্দেশ্যই পরাভূত হবে।

সর্বোপরি, গোটা পৃথিবীতে আজ উন্নয়নমূলক কর্মে 'ওপর থেকে'-র বদলে 'নিচে থেকে' দেখার চেষ্টা চলছে, অর্থাৎ যাদের জন্য উন্নয়ন তাদের সঙ্গে নিয়ে, তাদের বক্তব্য শুনে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। সেখানে মেগাসিটি প্রকল্পে স্থানীয় অংশগ্রহণের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়নি কেন? বিশেষ করে উন্নতিশীল বিশ্বের ক্ষেত্রে প্রায়ই এমন পরিকল্পনা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় যা স্থানীয় মানুষের কাছে অবাঞ্ছিত। এই সমস্যা দূর করার জন্যেই পরিকল্পনা রচনার পদ্ধতিতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের কথায় আজকের সমাজবিজ্ঞানী ও প্রশাসকেরা গুরুত্ব দিচ্ছেন।

সুতরাং সন্দেহ হচ্ছে যে যদিও জাতীয় নগরায়ণ আয়োগের সুপারিশেই রয়েছে মেগাশহর প্রকল্পের বীজ, তবুও এধরনের প্রকল্পের ফলে হয়তো এই দৈত্যাকার শহরগুলির প্রাধান্য বৃদ্ধিই পাবে, কমবে না। ফলে আয়োগের মূল সুপারিশ — নগরায়ণের বিকেন্দ্রীকরণ এবং ছোট ও মাঝারি শহরগুলির বহির্কাঠামো উন্নীত করা — তা গুরুত্বের অভাবে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে। ফলে স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় নগর পরিকল্পনায় যে চূড়ান্ত মেট্রোমনস্কতা লক্ষ করা গেছে, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। নামকরা শহর-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেউ কেউ তো এমনও মনে করেন যে মেগাসিটি স্কীম মানুষের মনে মিথ্যে আশা যোগাচ্ছে, কারণ আমাদের শহরগুলিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণের ইতিহাস ভালো নয়।

আর্থিক লাভজনকতার উপরে বেশি জোর দিয়ে নগর পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করলে ভারতের মত গরিব দেশে তা সার্থক না হবার সম্ভাবনাই প্রবল। আর্থিক দক্ষতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অন্তত ভারতের বা কোলকাতার পরিপ্রেক্ষিতে, হল দরিদ্র শহরবাসীর সামনে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ভালোভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার বন্দোবস্ত করা।

মেগাশহর প্রকল্প সম্পর্কে এটাই অবশ্য শেষ কথা নয়। এতদিন যেভাবে হয়েছে, তার চেয়ে অন্যভাবে, নতুন পথ ধরে, এবার নগর উন্নয়ন ও তার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বন্দোবস্তের ভাবনা শুরু হয়েছে। কিন্তু পরিবেশ ও উন্নয়নের বিষয়টিকে মেগাশহরের পরিপ্রেক্ষিতে খুঁটিয়ে না বিচার করলে এই প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

■ শহরের বহনযোগ্যতা (Sustainability)

আসুন, আমরা আরেকবার পরিবেশ ও উন্নয়নের দিকটি মেগাশহরের পরিপ্রেক্ষিতে খুঁটিয়ে বিচার করি।

পৃথিবীতে আজ এক অপ্রতিরোধ্য প্রক্রিয়া হিসেবে ঘটে চলেছে নগরায়ণের প্রক্রিয়া। শহরের মানুষের জীবনযাত্রার মানও ক্রমশ উন্নত হয়ে চলেছে। পৃথিবীর মাত্র ২ শতাংশ ভূমি অধিকার করে রয়েছে শহরগুলি, অথচ পৃথিবীর মোট উপকরণের তিন-চতুর্থাংশ ব্যবহার করছে তারা। সমপরিমাণ আবর্জনাও সৃষ্টি করছে এই শহরগুলি যা স্থানীয় ও সামগ্রিক বিশ্বের পরিবেশের উপরে যথেষ্ট খারাপ প্রভাব ফেলেছে। নতুন শতাব্দীতে পৃথিবীর শহরগুলিকে হয়ে উঠতে হবে এনার্জি ও উপকরণ দক্ষ (energy and re-

source efficient). মানুষের বসবাসের জন্য আরও সুবিধেজনক এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ। তা করতে হলে তৃতীয় বিশ্বের মেগাশহরগুলিকে শুধু বহির্কাঠামো ও উন্নততর পরিষেবাতে বিনিয়োগ করলেই চলবে না। এর জন্য দরকার 'সবচেয়ে ভালো পন্থাগুলিকে' (best practices) চিহ্নিত করার। আমাদের মেগাসিটি স্কীমের দীর্ঘ আলোচনায় কোথাও এই অত্যন্ত জরুরি আলোচনাগুলি ঠাঁই পায়নি। যেখানে বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে দাঁড়িয়ে গোটা পৃথিবী আজ প্রশ্ন তুলেছে শহরগুলির দারিদ্র, ভোগের ধরন ও বহনযোগ্যতা নিয়ে, বিশেষজ্ঞ ও সক্রিয় আন্দোলন-কর্মীরা গভীরভাবে ভাবছেন এসব প্রসঙ্গ নিয়ে, সেখানে ভারতের মেগাশহর প্রকল্পে আমরাই বা এসব প্রশ্নকে সতর্কভাবে এড়িয়ে যাবো কেন?

শহরের বহনযোগ্যতার চাবিকাঠিটি তাহলে কোথায়? কেমন শহর গড়ে তুললে তা কম এনার্জি চক্রাকারে ব্যবহার করে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত না করে বহুদিন টিকে থাকবে? এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে ছোট ছোট শহর গড়ে তোলার মধ্যে। উন্নতিশীল বিশ্বে, যেখানে গ্রাম-শহরের মধ্যে পরিষেবা ও সুযোগসুবিধের পার্থক্য অনেক বেশি, সেখানে মেগা-শহরগুলি যে ক্রমশই বেড়ে চলেছে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বৃহদায়তান এসব শহরের বাহ্যিক কাঠামো বাড়ালে তা আরও জনসংখ্যা আকর্ষণ করবে। আরও বড় হয়ে উঠবে এই শহরগুলো কারণ এই প্রকল্পে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন প্রসঙ্গে কোন রূপরেখা দেওয়া হচ্ছে না। অনুন্নত অর্থনীতিতে অত্যুন্নত বহির্কাঠামো গড়ে তুললে পরিবেশের উপরে চাপ বাড়বে বই কমবে না। তাই আজ পর্যন্ত চলে আসা নগরোন্নয়নের ধাঁচটা বদলানো দরকার, আরও ভারসাম্যমূলক উন্নয়ন গড়তে সামাজিক সাম্য আনা দরকার। একাজে মেগাসিটি প্রকল্প নিতান্তই অপারগ।

মূল কথা হল এই যে মেগাশহর পরিকল্পনা নিয়ে মগ্ন হয়ে আমাদের বিকেন্দ্রীকরণের নীতি থেকে সরে এলে চলবে না। মেগাশহরগুলির অ্যাগ্লোমারেশন অর্থনীতি (agglomeration economy) আরও আরও মানুষ, সম্পদ, বিনিয়োগ, সেখানে টেনে আনছে। এই একমুখী স্রোত বন্ধ করার একমাত্র রাস্তা হল এমন এক বসতি-কৌশল গ্রহণ করা যাতে দেশের সকল জনসাধারণের সামনে চাকরি, আবাসন, পরিবেশগত বহির্কাঠামো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি সমানভাবে পাওয়ার সুযোগ থাকে —তা সে তারা মেগাশহরের নাগরিক হোক, ছোট শহরের বাসিন্দা হোক বা গ্রামীণ মানুষই হোক। নগর পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমে, মেগাসিটি স্কীমের লাভজনক বহির্কাঠামো নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়।

উন্নতিশীল বিশ্বের সব দেশেই নগরোন্নয়নে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল আর্থিক অসঙ্গতি। আর্থিক বাধাগুলোকে অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন কম খরচে কী পরিবর্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা দেখা। মেগাশহরের জনবিস্ফোরণ রোধের জন্য এখন থেকেই তাই বিকেন্দ্রীকরণ দরকার। জল সরবরাহ, আবর্জনা ফেলা, পরিবহণ ও এনার্জি উৎপাদনের জন্য ছোট শহর ও গঞ্জগুলিতে সস্তা প্রযুক্তি নেওয়া যায়। অথচ মেগাশহরে তা হয় না। সেখানে দরকার হয় ব্যয়বহুল, জটিল প্রযুক্তির, যার মাধ্যমে পানীয় জল, পরিচ্ছন্ন বাতাস, চলনশীলতা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সরল সমস্যাগুলির সমাধান করতে হয়। ছোট ছোট শহরে এসব উদ্দেশ্যে পুনর্ভব প্রযুক্তি (renewable technology) গ্রহণ করা যায়।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সমস্যা আদৌ সমাধানযোগ্য কি না, কিংবা সমাধানের উপায় কী, তা নির্ভর করছে সমস্যাগুলিকে কোন দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখবো, তার ওপরে। মেগাশহরের বহির্কাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের অভাবনীয় বৃদ্ধি রুদ্ধ হবে না, বরং সমস্যা বাড়বে। শহরের দরিদ্রেরা নাগরিক সুযোগসুবিধেগুলি এমনিতেই তেমন একটা পান না, এবার আরও বঞ্চিত হয়ে নগরসমাজের প্রান্তবর্তী হয়ে পড়বে এবং শেষ অবধি দেশের উন্নয়ন-প্রক্রিয়ারই গতি রোধ করবে। সর্বোপরি, পরিবেশগত মেগা-সমস্যাগুলির চাপে শেষ অবধি মেগাশহরের অস্তিত্বই হয়ে পড়বে অনিশ্চিত।

সুতরাং মেগাশহর প্রকল্প নিয়ে মগ্ন হয়ে না থেকে আসুন আমরা গড়ে তুলি ভবিষ্যতের সেই শহর, ছোট-বড়-মাঝারি আয়তনের সেসব নাগরিক জনবসতি যা টিকে থাকবে আরও অনেক বছর।

উৎসবে উপহারে
লক্ষ তাঁতশিল্পীর রক্তে রাঙানো
বাংলার সেরা তাঁতবস্ত্রের সম্ভার

তন্তুশ্রী

(রাজ্য সরকারের একটি সংস্থা)
ওয়েস্টবেঙ্গল হ্যান্ডলুম অ্যান্ড পাওয়ারলুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ
৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (৭ম তল), কলকাতা-৭০০ ০১৩